উপসংহার

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে নগরায়ণের উদ্ভব ঘটলেও তার ভেতরেই লোকসমাজের ধারাটি সমান্তরালভাবে প্রবহমান থাকে। তার স্রোত বন্ধ হয় না। লোকসমাজই নানা ভাবে পুষ্ট করে চলে নগর-সমাজকে। নগর সভ্যতার পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে লোক জীবন চর্চার স্পর্শ। লোকসমাজের নানা পালনীয় বিষয় নগর-সমাজ নিজেদের মতো করে আত্তীকরণ করে নেয়। এর ফলে নগর সভ্যতায় সৃষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যেও থেকে যায় লোক সংস্কৃতির নানা বিষয়। লোকসংস্কৃতি নানা ভাবে সমৃদ্ধ করে চলে নগর জীবন ও তার সাহিত্যকে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির এক সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের সন্তান। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সামিল হয়েছিলেন দেশের নানা সমাজসেবামূলক কাজে। মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আলো যত প্রসারিত হয় ততো সে নিজের ঐতিহ্যকে জানতে চেষ্টা করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নানান ঘাত-প্রতিঘাত বাংলার তরুণ সমাজে ঢেউ তোলে। তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে যেমন সমৃদ্ধ হয়, বিশ্ব-সভ্যতার সঙ্গে নিজেদেরকে একাত্ম করে নেয়, ঠিক একই ভাবে তাদের মধ্যে দেখা যায় স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা, একাত্মবোধ। সেই আগ্রহ থেকেই তারা দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়। ফলে লোকসমাজের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়তে থাকে। শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় লোকসংস্কৃতির তথা লোকঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এক প্রাণের টান অনুভব করে। আর তার ফলেই লোকসংস্কৃতির নানা বিষয় শিল্প ও সাহিত্যে রূপায়িত হতে দেখা যায়।

অবনীন্দ্রনাথও ছিলেন এই সময়কার এক মানুষ। তিনি দেশকে ভালোবেসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দেশ সেবার ব্রতে। পাশে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথের সাথে মিলিত হয়ে সামিল হয়েছিলেন রাখীবন্ধন উৎসবে। খুলেছিলেন স্বদেশী জুতোর দোকান, নিবেদিতার সাথে সামিল হয়েছিলেন কলকাতায় প্লেগে আক্রান্ত মানুষদের সেবা কর্মে। নেমে এসেছিলেন মাটির কাছাকাছি। তাই এক নিপাট আধুনিক মানুষ হয়েও তিনি আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন দেশের অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি। মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন সেই সবের চর্চায়। যার ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁর চিত্রে ও সাহিত্যে লৌকিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নানা ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। তাই তাঁর প্রথম দিকের চিত্রকর্ম দেশীয় পদ্ধতিতে আঁকা। এরই পাশাপাশি তিনি বিদেশী পদ্ধতিও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দেশীয় নানা রীতির প্রতি তিনি ছিলেন সম শ্রদ্ধাশীল। এরই পাশাপাশি তাঁর রচিত সাহিত্য কর্মেও লোকসংস্কৃতির নানা দিক ব্যবহৃত হতে দেখা গেল। লোকসংস্কৃতির বস্তুধর্মী নানা উপাদান লোক খাদ্য ও পানীয়, লোকবস্ত্র, লোকযন্ত্র ও অস্ত্র, লোকশিল্প, লোকবাদ্য, লোক যানবাহন প্রভৃতির উল্লেখ যেমন তাঁর রচনায় দেখা

গেল, তেমনি দেখা মিলল লোকসংস্কৃতির ভাবধর্মী উপাদন রূপকথা, লোক বিশ্বাস-সংস্কার, লোকরীতি-নীতি, ছড়া, প্রবাদ, ব্রতকথা, লোকসংগীত, ডাক ও খনার বচন প্রভৃতি উপাদানের। তাঁর সমগ্র রচনা জুড়ে এই দুই উপাদানের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

লোকসমাজে বিভিন্ন ধরনের লোক খাদ্যের প্রচলন দেখা যায়। বিভিন্ন শস্য থেকে প্রস্তুত ভাত, ডাল, লুচি, মুড়ি, চিঁড়ে প্রভৃতি। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খই, নাড়ু, চালভাজা, ছোলাভাজা প্রভৃতির প্রচলন দেখা যায়। এরই পাশাপাশি আবার খেজুর রস, তালের রস পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবহার অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় একাধিক বার ব্যবহার করেছেন।

লোকসমাজে লোকতৈজসপত্র হিসাবে মিষ্টির ভাঁড়, গাছ লাগনোর টব, সরা মালসা, মুড়ি ভাজার খোলা, জলের কলসী গুড়ের হাঁড়ি, থালা, বাটি, গ্লাস, পিলসুজ, ডাবু, হাতা, ছান্তা, পানের বাটা, পানের ডিবা, জাঁতি, আবার লোহা থেকে তৈরী কড়া, সাঁড়াশী, বঁটি, খুন্তি, হাতা প্রভৃতির ব্যবহার মেলে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় এগুলির উল্লেখসহ স্থানে স্থানে ব্যবহার পদ্ধতিরও বর্ণনা করেছেন।

লোকসমাজে বসবাসকারী নর-নারী তাদের জীবনযাত্রায় নানান ধরনের পোশাক ব্যবহার করে। পুরুষেরা ধুতি, পাঞ্জাবী, পাগড়ি, গামছা, লুঙ্গি, চাদর ব্যবহার করে। মেয়েদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শাড়ির প্রচলন দেখা যায়। অবনীন্দ্র-সাহিত্যে এসবেরও দেখা মেলে।

জীবন জীবিকার প্রয়োজনে লোকসমাজ তার বিভিন্ন কাজকর্মে লোকযন্ত্র ও অস্ত্রের ব্যবহার করে থাকে। কৃষিকর্মের প্রয়োজনে লাঙল, কোদাল, কাস্তে, শাবল ব্যবহৃত হয়। আবার বঁটি, শীল-নড়া, গৃহস্থলীর নানা প্রয়োজন মোটায়। আবার কাঠের কাজে করাত, বাটালি, ছেনি, হাতুড়ি ব্যবহার করে। আবার অস্ত্র হিসাবে তীর, ধনুক, তরবারি, বল্লম, বর্শা, ছুড়ি, কাঁচি প্রভৃতির ব্যবহার করে। যা অবনীন্দ্র রচনাতেও নানান সময়ে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

লোক অলংকার হিসাবে হাতের চুড়ি, বালা, পায়ের নূপুর, কানের বিভিন্ন দুল, নাকের নথ, আঙুলে আংটি প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়। আবার বিভিন্ন ধরনের ফুল, তার থেকে তৈরী মালাও মানুষ অলংকার হিসেবে ব্যবহার করে। আবার প্রসাধন হিসেবে হলুদ, দুধের সর, কাজল, সিঁদুর এর ব্যবহার দেখা যায়। এই দুই উপদানেরই উল্লেখ তাঁর রচনায় মেলে।

লোকবাদ্য যন্ত্রেরও উল্লেখ তিনি তাঁর কাহিনীর নানা স্থানে উল্লেখ করেছেন। প্রাকৃতজ উপাদান থেকে তৈরী বাঁশি, একতারা, দোতারা, ঢাক, ঢোল, শাঁক প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়। আবার ঝাঁঝ, কাঁসর, ঘন্টা, করতাল পূজা-অর্চনায়, সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়।

লোকযানবাহনের বহুল ব্যবহার অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে করেছেন। বিশেষ করে পালকি ও নৌকার ব্যবহার তাঁর রচনায় একাধিকবার এসেছে। এরই পাশাপাশি গরুর গাড়ি, ঠেলা গাড়ি, ডুলি, চতুর্দোলা, ডোঙ্গা, ডিঙ্গির ব্যবহারও চোখে পড়ে।

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যে লোকশিল্পের ব্যবাহরও চোখে পড়ে। বাঁশ থেকে তৈরী বিভিন্ন সরঞ্জাম — পোলা, খালুই, তালপাতা থেকে তৈরী বসার আসন, নারকেল গাছের পাতা থেকে প্রস্তুত ঝাঁটা, এরই পাশাপাশি কাঁথা, টুপি, বেত থেকে তৈরী সরঞ্জাম, কাঠের বিভিন্ন আসবাবপত্র, উনুন, দোলনা, কুমোরের তৈরী মাটির নানা দ্রব্যের ব্যবহার তিনি তাঁর রচনায় করেছেন।

এরই পাশাপাশি তাঁর রচনায় এসেছে বিভিন্ন ধরনের লোকনেশা দ্রব্য ও লোকায়ত রীতিতে প্রচলিত মাপজোখ বা পরিমাপের ব্যবহার। নেশাদ্রব্য হিসেবে তামাক, গাঁজা, হাঁড়িয়া, মহুয়ার ফল থেকে প্রস্তুত তরল পানীয়, সিদ্ধি, তাড়ি এবং মাপজোখ বা পরিমাপ হিসেবে পলা, গণ্ডা, ছিলিম, ছটাক, সের, পাই, মুঠো, পোয়া, দুকুড়ি প্রভৃতির প্রয়োগ দেখা যায়।

লোকসংস্কৃতির বস্তুধর্মী উপরোক্ত উপাদানগুলির পাশাপাশি তাঁর রচনায় লোকসংস্কৃতির ভাবধর্মী উপাদানের ব্যবহারও চোখে পড়ে। প্রথমেই আসে লোক বিশ্বাস-সংস্কারের প্রসঙ্গ। সমাজে নানাবিধ অনিশ্চয়তা, মানসিক দুর্বলতা, ভালমন্দ ধারণা প্রভৃতির হাত ধরেই লোকবিশ্বাস-সংস্কারের বিকাশ লাভ ঘটেছে। অবনীন্দ্রনাথের রচনাতেও এসেছে এই প্রসঙ্গ। দেবতার কাছে মানত, পাপ-পুণ্য, শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কিত নানা বিশ্বাস সংস্কারের প্রসঙ্গ তাঁর রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে।

লোকসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা রূপকথা। রূপকথার মধ্য দিয়ে মানুষ তার সকল অপূর্ণ ইচ্ছার যেন চরিতার্থতা ঘটায়। তাই অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও গল্পের শেষে শুভ শক্তির জয়লাভ করে। অবনীন্দ্রনাথের রচনাতেও এসেছে এই রূপকথার প্রসঙ্গ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তাঁর ‘শকুন্তলা’, ‘ক্ষীরের পুতুতল’, ‘রাজকাহিনী’ সহ অনেক রচনায় এই প্রসঙ্গের আভাস মেলে। আবার তাঁর রচনার অনেক স্থানে তিনি কোনো প্রসঙ্গ বোঝাতে গিয়ে রূপকথার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন।

লোকসাহিত্যের অপর একটি বিষয় ‘ব্রতকথা’ নিয়েও তিনি গবেষণাধর্মী বই লিখেছেন ‘বাংলার ব্রত’ নামে। এরই পাশাপাশি অনেক রচনায় ব্রতের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন কাহিনীর প্রয়োজনে।

সঙ্গীত মানুষের শ্রমযন্ত্রণা কমিয়ে দেয়। মানুষের মনে নব আনন্দের সঞ্চার ঘটায়। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যে অল্প পরিমানে সঙ্গীতের ব্যবহার দেখা যায়। এরই পাশাপাশি সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকক্রীড়া যেমন - লুকোচুরি, হাডুডু, ইকড়ি-মিকড়ি প্রভৃতি খেলার প্রসঙ্গ তার কিছু রচনায় এসেছে।

আবার বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা, ছড়া, ডাক ও খনার বচন প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায় তাঁর সাহিত্যে। অবনীন্দ্রনাথের রচনায় প্রবাদ, প্রবাদ মূলক বাক্যাংশ ও বাগ্‌ধারার যথেচ্ছ প্রয়োগ দেখা যায়। কোথাও কোথাও তিনি প্রবাদের মূল রূপ অবিকৃত রেখেছেন, কোথাও কিছুটা পরিবর্তন করে নিয়েছেন, আবার কখনো প্রবাদকে গানের আকারে তুলে ধরেছেন। আবার ছড়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিনি বৈচিত্র্য এনেছেন। বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি যেমন ছড়ার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন, আবার তাঁর অনেক রচনায় লৌকিক ছড়ার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন কাহিনীর প্রয়োজনে। কোথাও তিনি লৌকিক ছড়াকে অপরিবর্তিত রেখে ব্যবহার করেছেন, কোথাও ছড়ার কিছুটা পরিবর্তন করে ব্যবহার করেছেন, আবার কখনো চরিত্রের কথোপকথনে বা গানে ছড়ার ব্যবহার করেছেন। এরই পাশাপাশি তাঁর রচনায় অল্প পরিমানে ডাক ও খনার বচন এর ব্যবাহর লক্ষ্য করা যায়।

এরই পাশাপাশি তাঁর রচনায় নানা লোকপ্রথা বা লোকাচার বা রীতিনীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবতা সংক্রান্ত, জন্ম সংক্রান্ত, সামাজিক ও ধর্মীয় নানা উৎসব অনুষ্ঠান বিষয়ক লোকাচারের উল্লেখ তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। এই লোকাচারের সঙ্গে বিশ্বাস-সংস্কারের যোগ ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য জুড়ে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান কীভাবে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর একটি সামগ্রিক আলোচনা কোথাও না হলেও তাঁর সাহিত্যের এই দিকটি ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে কিছু বিক্ষিপ্ত আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে। নির্মলেন্দু ভৌমিক (‘লোকশিল্প ও সাহিত্য ঃ অবনীন্দ্রনাথ’ (সংস্ককরণ ১৯৯৭) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য নাটক সংগীত ও দৃশ্যকলা আকাদেমি (রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২০-৩০) গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ছড়া ও রূপকথার ব্যবহার সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। শ্রীভূদেব চৌধুরী (‘লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ’ (সংস্করণ ১৯৯৬) দেজ্‌ পাবলিশিং, কলকাতা) গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তি জীবন ও তাঁর রচনার বিষয় বৈচিত্র্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। অশোক বিজয় রাহা তাঁর (‘বাণীশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ’ (২০১০), ভারতী, কলকাতা - ৭৩, পৃষ্ঠা ৬৫-৭৯) রচনায় অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ছড়া কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। শঙ্খ ঘোষ তাঁর (‘কল্পনার হিস্টিরিয়া’ (১৯৯৯) প্যাপিরাস, কলকাতা - ৭০০০০৪) গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের রূপটি তুলে ধরেছেন। দোবলীনা ঘোষ ‘অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যে লোক ঐতিহ্যের উপাদান’ (পশ্চিমবঙ্গ, অবনীন্দ্র সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ (১৪০২), কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৪৫-১৫০) শীর্ষক প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথের ‘শকুন্তলা’, ‘ক্ষীরের পুতুল’, ‘রাজকাহিনী’, প্রভৃতি গ্রন্থে লোকবিশ্বাস সংস্কার, লোককথা, রূপকথা, ছড়ার ব্যবহার

সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেছেন। এছাড়াও অবনীন্দ্র সাহিত্যে লোকপ্রথা বা রীতি, লোকক্রীড়া, ডাক ও খনার বচন, প্রবাদ এর ব্যবহার দেখা যায় তা এই প্রবন্ধে আলোচিত হয় নি।

তাই সমগ্র অবনীন্দ্র সাহিত্যে লোকসংস্কৃতির বস্তুধর্মী ও ভাবধর্মী উপাদানগুলি কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তার সামগ্রিক আলোচনার জন্যই এই গবেষণা কর্মের প্রয়াস।

—০—